১৪ রবীন্দ্রসৃষ্টিসমীক্ষা (১ম), পৃ: ১৬৪-৫

১৫ পথে ও পথের প্রান্তে (বি, ভা) ১৩৫১, পৃ: ৮৫-৬ ; চিঠির তারিখ ২৩শে শ্রাবণ ১৩৩৬

১৬ তদেব

১৭ রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী ১ম খণ্ডে পুলিনবিহারী সেন-কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ: ২৬৩।

১৮ রবীন্দ্ররচনাবলী ৬ (প, ব, স) পৃ. ১০৩৩

১৯ জীবনস্মৃতি, পৃ: ১০১

২০ Rabindranath Tagore Poet and Dramatist—Edward Thompson, London, 1948, P. 93

২১ কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক—শঙ্খ ঘোষ, ১৯৬৯, পৃ: ১৯

২২ প্রসঙ্গ : নাট্য—শম্ভু মিত্র, ১৯৭১. পৃ: ১৪২

২৩ রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র প্রবন্ধ. রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪ (প, ব, স) পৃ: ৭৪৪-৫

২৪ রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (১ম), পৃ: ২৭৪

২৫ রবীন্দ্ররচনাবলী ৬, (প, ব, স,), পঃ ১০৩৩-৪

২৬ রবীন্দ্রসৃষ্টিসমীক্ষা (১ম), প: ১৬৫

২৭ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা (অখণ্ড সং)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃ: ৩৩৬

২৮ পথে ও পথের প্রান্তে, পৃ: ৮৫-৬

২৯ তপতীর ভূমিকা. রবীন্দ্ররচনাবলী ৬, (প, ব, স), পৃ: ১০৩৩

৩০ রবীন্দ্রসৃষ্টিসমীক্ষা (১ম), পৃ: ১৬৭

৩১ তদেব, পৃ: ১৬৮

৩২ তদেব, পৃ: ১৬৫

৩৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)—সুকুমার সেন, পৃ: ২৮৯

৩৪ রবীন্দ্রনাট্যধারা—আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৩৭৩, পৃ: ১৭৫

৩৫ এই মন্তব্য করার সময় আমি The Verbal Icon গ্রন্থে উইমশাট ও বিয়ার্ডসলি-র প্রবন্ধ The Intentional Fallacy-র সাবধানবাণী ভুলিনি "…the design or intention of the author is neither available nor desirable as a standard for judging the success of a work of literary art…Critical inquiries are not settled by consulting the oracle." (The Verbal Icon—Wimsatt Jr , Second Noonday Paper ed., 1930, P. 3-18) নিশ্চয়ই 'success' বা সফলতা বিচারে লেখকের উদ্দেশ্য মানদণ্ড হতে পারে না, কিন্তু রচনায় কোন্ জিনিসটা কেন তিনি করছেন তা বোঝার জন্য লেখকের অভিপ্রায় জেনে নেওয়া দরকার। সাফল্যবিচার অবশ্য করতে হবে স্বাধীনভাবে।

॥ নাট্যরূপান্তর ঃ গদ্য থেকে গদ্যছন্দে ॥

কালের যাত্রা

কালের যাত্রা গ্রন্থের প্রথম নাটক রথের রশি রথযাত্রা[১] নামে প্রথম প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩০ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দুই রূপের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যের বিবরণ দেবার আগে দেখি এই দুই রূপের মূল প্রসঙ্গটি কী ? মূল প্রসঙ্গটিকে বিবেকানন্দের ভাষায় প্রকাশ করা চলে, "এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া আকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"[২] রবীন্দ্রনাথ নিজেও নাটকের মূল বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি,

কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে ; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।"[৩]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাটকে জনতাদৃশ্যের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথাও আমাদের স্মরণ করা দরকার। প্রকৃতির প্রতিশোধে জনতাদৃশ্যগুলি জীবন্ত, তাদের ভাষা একেবারে পার্থিব এবং তারপর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রায় নাটকে আমরা এই জনতাদৃশ্য পাই। টেকনিক এবং তত্ত্বগত প্রয়োজনে নাটকে ঘটনাস্থান প্রায়শই পথ, এবং পথ যেহেতু ঘটনাস্থান সেই কারণে পথ-চলতি জনসাধারণ, লোক-চলাচল-দৃশ্য নাটকে অনিবার্যভাবে জায়গা পেয়েছে। যদিও প্রকৃতির প্রতিশোধে আমরা পথদৃশ্যে জনতার চলাচল প্রথম পাই, কিন্তু মনে হয় এই জাতীয় দৃশ্যচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় শেকসপীয়রীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শেকসপীয়রের রক্তেমাংসে সুসম্পূর্ণ নাগরিকবৃন্দের তুলনায় টমসন প্রকৃতির প্রতিশোধের নাগরিকদের ছায়াশরীর বলেছেন।[৪] প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে এ অভিযোগ সত্য হলেও রাজা ও রাণীতে পথে লোকারণ্যের বর্ণনায় বা বিসর্জন নাটকে ক্ষুব্ধভীরু প্রজাবৃন্দের রূপায়ণে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শেকসপীয়র-তুল্য সার্থকতা অর্জন করেছেন। নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ যখন শেকসপীয়রীয় রীতি ত্যাগ করলেন তখনও দেখি জনতাদৃশ্যবর্ণনায় তিনি সেই শেকসপীয়রীয় রীতির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছেন। এই সময় সন্দেহ হয়, অন্য কোনো কারণে এই দৃশ্যাবলী রচনায় তিনি উৎসাহী হতেন। পথের সঙ্গে জনতাদৃশ্যের অনিবার্য সম্পর্ক একটি কারণ। অন্য কারণ হয়তো এই—এই দৃশ্যগুলির সাহায্যে প্রতীকনাট্যের তত্ত্বময় অতিবাস্তব জগতের সঙ্গে তিনি যেন দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহতরঙ্গিত সংসারের সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। এই দৃশ্যগুলির উপস্থিতির ফলে প্রতীকনাট্যের ভূগোল কাল্পনিক থাকে না। কোন সত্যের সম্মুখীন হয়ে সাধারণ মানুষের যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, সংশয়, বিদ্রূপ, পরস্পরকে নিন্দাবাদ, পূর্ববিশ্বাসের অচিরবিস্মৃতি, দু'একজনের গভীর আনুগত্য, ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী সঙ্গত প্রতিক্রিয়াগুলি এই সব জনতাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।[৫] রাজা নাটকের জনতাদৃশ্য আলোচনা করলেই রবীন্দ্রনাট্যের জনতাদৃশ্যের সাধারণ লক্ষণ-গুলো ধরা পড়ে। কোন কোন দিক থেকে এই দৃশ্যগুলিকে গ্রীক নাটকের বহুস্বরসমন্বিত কোরাস বলে মনে হয়। কোরাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের জনতাদৃশ্যের তুলনা আরো বেশি সঙ্গত মনে হয় রথযাত্রা বা রথের রশি নাটকে—যেখানে নাটক সংহত জনতাদৃশ্য বই কিছু নয়। রথযাত্রা বা রথের রশি নাটকে এসে যেন রবীন্দ্রনাথের জনতাদৃশ্য শেকসপীয়রীয় স্তর থেকে গ্রীকনাট্যের স্তরে উন্নীত হল। এখানে জনতার বহুস্বর একস্বরে সমন্বিত থেবাইয়ের নাগরিকদের মতো,[৬] কলোনাসের বৃদ্ধদের মতো,[৭] মার্ডার ইন দা ক্যাথিড্রালের ক্যাণ্টারবারি-ললনাদের মতো[৮]। রথযাত্রা ও তার রূপান্তর রথের রশি জনতারই নাটক জনতাদৃশ্যই নাটক, কারণ এই নাটকে সাধারণ মানুষ, জনসাধারণের আসন্ন প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হয়েছে ; বলা হয়েছে 'সম্বন্ধের অসাম্য' ঘুচিয়ে 'শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য' লাভ করবে।

রথযাত্রা থেকে রথের রশিতে বিবর্তন বিবেচনা করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে নামকরণের পরিবর্তন। যে নাটক প্রাথমিক উৎস, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শান্তিনিকেতনের তৎকালীন সেই তরুণ আশ্রমিকের সেই নাটকেরও নাম ছিল রথযাত্রা। সেই নামসাদৃশ্য মুছে ফেলার ইচ্ছা হয়তো নামপরিবর্তনের অন্যতম কারণ। নামপরিবর্তনের বড় কারণ নিহিত অন্যত্র। রথযাত্রায় রথটাই প্রধান। রথ এখানে সমাজ। কিন্তু রবীন্দ্রনাটকের জোরটা সমাজের উপর নয়, সমাজকে গতি দেয় যে শক্তি তার উপরে। রথকে গতি দেয়, টানে, রথের রশি। সমাজরথকেও গতি দেয়—এক-এক সময় এক-এক শক্তি, কখনো সামন্তরা, কখনো ধনিক, আবার কখনো বা শ্রমিক। সমাজরথকে ভবিষ্যতে গতি দেবে যে-রশি যে-শক্তি তারই কথা বলা হয়েছে, তাই রথযাত্রা নাম ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথ নাটকের নাম দিলেন রথের রশি। তাছাড়া আকারে-ছোট রথযাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নাট্যদৃশ্য'।[৯] রথের রশিতে' বিধৃত হয়েছে ইতিহাসের নাটক, মহাকালের নাটক ; তাকে কিছুতেই আর নিতান্ত 'নাট্যদৃশ্য' বলা চলে না।

রথযাত্রার জগৎ সম্পূর্ণ পুরুষের জগৎ, কিন্তু রথের রশির প্রথমেই শুধু আমরা রথযাত্রার মেলায় মেয়েদের সংলাপ পাই না, এই পরিবর্তিতরূপে মেয়েরা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ব্রাহ্মণ-সামন্ত-ধনিকের পরে শক্তির কেন্দ্র হবে শূদ্র, এই ইতিহাস-তত্ত্বের সঙ্গে মেয়েদের প্রতিক্রিয়া যুক্ত হওয়ায় তত্ত্ব পেয়েছে বাস্তব পটভূমি। মেয়েলি সংলাপ ইতিহাসতত্ত্বকে দিয়েছে মূর্ততা এবং অবয়বত্ব। রথ চলছে না, রথের রশি অনড় পড়ে আছে, এই দৃশ্য দেখে কোনো রমণী বলে, 'গালিয়ে নেব আমার হার, আমার

বাজুবন্ধ,/দড়ির ডগা দেব সোনা-বাঁধিয়ে।' কেউ বলে, 'আহা, কী সুন্দর রূপ গো।' অন্যেরা সায় দেয়, 'যেন যমুনানদীর ধারা', 'যেন নাগকন্যার বেণী'। রথের রশি নিষ্ক্রিয় পড়ে আছে—এই দৃশ্য মেয়েদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তার ফলে মহাকালের গতির পিছনে একটি বাস্তবজীবনের পশ্চাৎপট রচিত হয়েছে।

(১) রথ না চললে কিছুই চলবে না।
চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।
(২) গড় করি তোমায় দড়ি-নারায়ণ! প্রসন্ন হও!
(৩) জয় দড়ীশ্বর, জয় মহাদড়ীশ্বর, জয় দেবদেবদড়ীশ্বর,
গড় করি তোমায়, টলুক তোমার মন।
মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন।
পাখা কর্ লো ; পাখা কর্, জোরে জোরে।

রথযাত্রায় সেই সন্ন্যাসী ছিল না, যে সন্ন্যাসী রথের রশিতে বারবার মঞ্চে প্রবেশ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছে মূর্তিমান বিবেকের মতো। নাটকের মধ্যে কবি যেমন নাট্যকারের প্রতিভূ, তেমনি এই সন্ন্যাসী একদিকে কবির প্রতিভূ, অন্যদিকে কালপুরুষ বিধাতাপুরুষের প্রতিনিধি—তার সতর্কবাণী যেন দৈববাণী।

(১) তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,
কিছুই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ঐ যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।
(২) সর্ব্বনাশ এল।
গুরু গুরু শব্দ মাটির নিচে।
ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।

মেয়েদের এবং সন্ন্যাসীর অনুপস্থিতিতে প্রবাসী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রথম রূপে একদিকে যেমন বাস্তব জীবনযাত্রার পশ্চাৎপট ছিল না, তমনি অন্যদিকে ছিল না নাটকীয় ঘটনার উপরে ভবিতব্যভারাতুর মেঘ।

মেয়েদের দল এবং সন্ন্যাসী চরিত্র যোগ করায় নানা জনের প্রবেশ-প্রস্থান ক্রমের পরিবর্তন করতে হয়েছে। রথযাত্রার সূত্রপাত হয়েছিল নাগরিকদের সংলাপে, রথের রশি শুরু হয়েছে রথযাত্রার মেলায় মেয়েদের সংলাপ দিয়ে। দ্বিতীয় রূপে নাগরিকদের কথোপ-কথন পাই অনেক পরে। পূর্বরূপে নাগরিকদের পরেই সৈন্যদল প্রবেশ করেছিল, রূপান্তরে সৈন্যদল প্রবেশ করেছে অনেক পরে। অনুরূপভাবে পূর্ব রূপের তুলনায় মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ নূতন রূপে বিলম্বিত হয়েছে। সংলাপের এই জাতীয় পুনর্বিন্যাসকালে পূর্বের সংলাপ প্রায় অবিকৃতভাবে গৃহীত হলেও কোথাও কোথাও সংলাপের মূলভাব এক রেখেও ভাষাগত পরিবর্তন করা হয়েছে ; যেমন নিচের উদ্ধৃত অংশে হয়েছে বক্তব্যের অতিস্পষ্টতাদোষ দূরীকরণের প্রয়োজনে।

রথযাত্রা

মন্ত্রী ॥ দেখ শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চলেছে বাবা মহাকালের রথচক্র ঘোরার দ্বারা সেইটের প্রমাণ হয়ে থাকে। যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা তখন তাঁরা রশি ধরতে-না-ধরতে রথটা ঘুম-ভাঙা সিংহের মত ধড়ফড় করে নড়ে উঠত। এবারে যে কিছুতেই সাড়া দিল না। তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্রই বলো, শস্ত্রই বলো সব অর্থহীন হয়ে পড়েছে—অর্থ এখন তোমারই হাতে। সেই তোমার সার্থক হাতটি আজ রথের রশিতে লাগাতে হবে।

রথের রশি

মন্ত্রী ॥ অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন,
তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।

রথযাত্রা শেষ হয়েছিল 'not with a bang, but a whimper'।[১০] শেষ সংলাপ পাই পুরোহিত ও সৈনিকের সঙ্গে কবির। কবির যে উক্তির পরে যবনিকা নেমে এসেছে তার মধ্যে কোন দৃঢ়তা বলিষ্ঠতা নেই। যে শ্রেণীসংঘর্ষের তীব্রতা, সামাজিক শক্তির ঐতিহাসিক বিবর্তন নাটকের মূল বক্তব্য, তার পাশে নাট্যপরিণামের এই উক্তি বিবর্ণ রক্তশূন্য, ফলে সংগতিহীন মনে হয়। তার সঙ্গে তুলনায় মেয়েদের প্রশ্নের উত্তরে কবির উক্তি ও সন্ন্যাসীর জয়ধ্বনির মধ্যে রথের রশির যে পরিণতি তার মধ্যে নাট্যবিষয়ের উপযুক্ত দৃঢ়তা

প্রখরতা ও বলিষ্ঠতা এসেছে, ক্রান্তিকালের বাণী তার মধ্যে সংক্রামিত। তুলনার দ্বারা এই মন্তব্যের যথার্থতা স্পষ্ট হবে।

রথযাত্রা

সৈনিক ॥ আমরা কি করব?

পুরোহিত ॥ আমি কি করব?

কবি ॥ তাড়াতাড়ি কিছু করতেই হবে এমন কথা নেই। দেখো, ভাবো। ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠো। তারপরে ডাক পড়বার জন্য তৈরি হয়ে থাকো।

রথের রশি

প্রথমা ॥ তারপরে হবে কী।

কবি ॥ তারপরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া
এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে;
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী ॥ জয়—মহাকালনাথের জয়!

রথযাত্রা-র পরিণতি জোরালো নয়। কবির পরামর্শ পরাভূত শ্রেণীর প্রতি। রথ চালালো শূদ্ররা; যারা হেরে গেল সেই পুরোহিত-সৈনিককে কবি পরামর্শ দিয়েছে 'ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে' ওঠার। হয়তো শ্রেণীস্বার্থত্যাগের পরামর্শ। 'তারপরে ডাক পড়বার জন্যে তৈরি হয়ে থাকো।' কিন্তু রথের রশির পরিণাম অনেক বেশি জোরালো। সংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েদের ডাক দিয়ে কবি বলেছে এতদিনের পূজোর পদ্ধতি ভুল। কবি খোলা গলায় প্রার্থনা করেছে 'যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে; /যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।' কবির এই উক্তির মধ্যে রয়েছে শ্রমজীবী শ্রেণীর অভ্যুত্থানের প্রতি কবির সমর্থন। তারই সঙ্গে জোর গলায় গলা মিলিয়ে বিবেকরূপী সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি দিয়েছে 'জয়—মহাকালনাথের জয়!' প্রথমরূপে পরাভূতের প্রতি মানিয়ে নেবার পরামর্শ, দ্বিতীয়রূপে নবজাগ্রত শক্তির প্রতি জয়ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন। কবির সমর্থন সরে এসেছে সুস্পষ্টভাবে অন্য কেন্দ্রে।

কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের চিহ্ন রয়েছে অন্য জায়গায়। রথযাত্রা গদ্যে লেখা, রথের রশিতে সেই গদ্য সংলাপ গদ্যছন্দে পরিবর্তিত। "সুরচিত গদ্যমাত্রেরই একটা ছন্দপ্রবাহ আছে। তার ধ্বনির উত্থানপতনে, তার যতির হ্রস্বদীর্ঘতায়, তার শব্দব্যবহারের সুমিত বলয়ে—তৈরি হয় এই ছন্দ। এর কোনো পূর্বনির্দিষ্ট নিরূপিত ধরণ নেই। একেই বলা যায় গদ্যের ছন্দ। এই ছন্দ শুনেই পথের পাঁচালীর অপু একদিন মুগ্ধ হয়েছিল তার ছেলেবেলার পাঠশালায়, ভেবেছিল বড় হয়ে খুঁজে নেবে রামায়ণ-মহাভারতের দেশ। আর এর তুলনায় গদ্যছন্দ কথাটির প্রয়োগ একটু বিশেষিত। গদ্যকবিতা নামে চিহ্নিত যে বিশেষ রচনাশ্রেণীটি, এ হলো তার ছন্দ। এরও নেই কোনো পূর্বনির্ধারিত রূপ। কিন্তু শ্রুতিতে বা অনুভবে বুঝে নেওয়া যায় সাধারণ গদ্যের ছন্দের থেকে এর স্বতন্ত্র এক স্পন্দন।"[১১] স্বাতন্ত্র্য একটা আছে, শ্রুতি বা সূক্ষ্ম অনুভূতিতে মাত্র ধরা পড়ে যদিও। তাই অবনীন্দ্রনাথের আলোর ফুলকি রচনাতে পাই গদ্যের ছন্দ, তাকে শব্দ বিন্যাসের ঈষৎ পুনর্বিন্যাসের দ্বারা গদ্যছন্দের কবিতায় রূপান্তরিত করতে পারেন বুদ্ধদেব বসু।[১২] গদ্যের ছন্দ আর গদ্যছন্দে কোনো পার্থক্য না থাকলে বুদ্ধদেব বসুকে ঐ শ্রম স্বীকার করতে হতো না। রথযাত্রার সংলাপের গদ্যের ছন্দকে রথের রশির সংলাপের গদ্যছন্দে রূপান্তরিত করতেও রবীন্দ্রনাথকে সমান যত্নে এক-একটি শব্দকে সরিয়ে অন্য শব্দ বসাতে হয়েছে, অথবা পুরনো শব্দটিকেই স্থানান্তরিত করে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। সমাপিকা ক্রিয়াপদ অধিকাংশ সময়ে বসেছে কর্মের বা অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে; যেখানে গদ্যের মতো বাক্যের শেষে বসে, সেখানে ব্যতিক্রম ঘটে বৈচিত্র্যসৃষ্টির দায়ে। রথযাত্রার সংলাপের গদ্যের ছন্দ থেকে রথের রশির সংলাপের গদ্যছন্দে রূপান্তরকালে কী জাতীয় ছোট-ছোট পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে শব্দবিন্যাসে তথা স্পন্দনে তার প্রমাণ হিসেবে পর পর দুটো অংশ তুলে দিচ্ছি।

রথযাত্রা

২ সৈনিক ॥ কবি, আজ রথযাত্রায় এই যে সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড হয়ে গেল, কেন বুঝতে পারো ?

কবি ॥ পারি বৈ কি।

১ সৈনিক ॥ পুরুতের হাতে রাজার হাতে রথ চলল না, এর মানে কী ?

কবি ॥ ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মানলেই হয় না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।

১ সৈনিক ॥ কবি, তোমার কথা শুনলে হঠাৎ মনে হয়, হয়তো বা একটা মানে আছে খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না।

কবি ॥ ওরা বাঁধন মানতে চায় নি, শুধু চলাটাই মেনেছিল। তাই রাগী বাঁধনটা উন্মত্ত হয়ে ওদের ওপর ল্যাজ আছড়াচ্ছে; গুঁড়িয়ে যাবে।

পুরোহিত ॥ আর তোমার শূদ্রগুলিই কি এত বুদ্ধিমান যে দড়ির নিয়ম সামলে চলতে পারবে ?

কবি ॥ হয়তো পারবে না। একদিন ভাববে ওরাই রথের কর্তা, তখনই মরবার সময় আসবে। দেখো না কালই বলতে শুরু করবে, আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের জয়। যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকেই গাল পাড়তে বসবে। তখন এঁরাই হয়ে উঠবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

রথের রশি

২ সৈনিক ॥ একী উল্টো পাল্টা ব্যাপার কবি।
পুরুতের হাতে চলল না রথ রাজার হাতে না—
মানে বুঝলে কিছু ?

কবি ॥ ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নিচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানে নি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে—দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরোহিত ॥ তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরা কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি ॥ পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এরাই হবেন বলরামের চেলা--
হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

কালের যাত্রার অন্তর্ভুক্ত অন্য নাটিকা 'কবির দীক্ষা'র নাম মাসিক বসুমতীর বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় প্রকাশকালে ছিল 'শিবের ভিক্ষা'। পত্রিকার সূচীপত্রে রচনাটিকে 'কবিতা' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। দুইজনের সংলাপ অবলম্বনে এই নাটিকা লিখিত হলেও বস্তুত এটি একটি কবিতা। কিঞ্চিৎ নাট্যলক্ষণ থাকায় যদি এই রচনাটিকে এবং রথের রশি রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীর অন্তর্ভুক্ত করতেই হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রচনাবলীর গদ্যনাটকসম্বলিত খণ্ডের মধ্যে নয়, আখ্যানকাব্য ও নাট্যকাব্য সম্বলিত খণ্ডটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কারণ রচনা দুইটিতে নাট্যের গুণের চেয়ে কাব্যের গুণ বেশি এবং রচনাদ্বয়ের সংলাপ গদ্য নয়, গদ্যকবিতা।

শিবের ভিক্ষার নাম কবির দীক্ষা হওয়ায় বক্তব্যবিষয়ের কোন পরিবর্তন হয় নি—যদিও নামকরণের সুদূর পরিবর্তনে নাটকের মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে এমন সন্দেহ হতে পারে। শিবের ভিক্ষায় শিবের কথা থাকলেও, শিবের শিষ্য যে কবি সেই কথাই নাটিকার কেন্দ্রীয় বক্তব্য। সুতরাং এই নামান্তর নাটিকার বিষয়বস্তু বিবেচনায় সংগত হয়েছে। দুই রূপেই কবি বলেছে, 'শিবমন্ত্র তো আমিই দিয়ে থাকি। আমি যে শৈবসন্ন্যাসী। কালিদাস ছিলেন শৈব। সেই পথের পথিক কবিরা।'

শিবের ভিক্ষার গদ্যসংলাপ কী ভাবে গদ্যকবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে তার একটি উদাহরণ দিই। গদ্যকবিতায় রূপান্তরে যে ব্যঞ্জনাধর্ম অর্জিত হয়েছে তার ফলে যে কথা মূল গদ্যে অতি স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন হয়েছিল এখন সে প্রয়োজন আর নেই, অথচ বক্তব্য তার ভগ্নাংশও হারায় নি।

শিবের ভিক্ষা

মৃত্যুতে তাঁর বিলাস আছে বলে নয়, মৃত্যুকে জয় করবার আশ্বাস দেবেন বলে। অমরাবতীতে যে দেবতাদের বাসা, মৃত্যুর সঙ্গে তাঁদের কোন দ্বন্দ্বই নেই—তাঁরা অমৃত পান করে পূর্ণ হয়েই বসে আছেন। কিন্তু মানুষের যে শিব, বিষ পান করে তাঁকে বিষ কাটাতে হয়, শ্মশানের ভিতর দিয়েই মৃত্যুকে জয় করতে হয়। মানুষের কাছে ভিক্ষুক দেবতা তার প্রাণও চাচ্ছেন, যারা অসংকোচে সেই ভিক্ষা দিতে পারে, তারাই যথার্থ-ভাবে প্রাণে বেঁচে যায়—যারা পারলে না, তাদের সকল রাস্তাই মরবার দিকে পৌঁছে দেয়। লোকালয়ের পথে পথে দ্বারে দ্বারে দেবতার কণ্ঠে রব উঠেছে ভিক্ষে দাও, ভিক্ষে দাও। সেই দেবতার ভিক্ষে অল্প নয়, সে মুষ্টিভিক্ষে নয়, অবজ্ঞার ভিক্ষে নয়। আপনার প্রতি যে দাতার শ্রদ্ধা আছে, তারই দান অকৃপণ হয়, পূর্ণ হয়, তার মধ্যে হীনতা থাকে না, অশুচিতা থাকে না। দানে যখন মলিনতা, নিস্তেজতা দেখি, তখনি বুঝি দাতা শ্রদ্ধা হারিয়েছে, নির্ঝরিণীর স্রোত যেই অলস হয়ে পড়ে, পাঁক সেই প্রধান হয়ে ওঠে, সেই কলুষিত দানে দুর্বল আত্মার আত্মাবমাননাই প্রকাশ পায়, দেবতার তৃতীয় নেত্র অগ্নিদীপ্ত হয়ে ওঠে।

কবির দীক্ষা

মৃত্যুতে তাঁর বিলাস বলে নয়, মৃত্যুকে জয় করবেন বলে।
যে দেবতারা অমরাবতীতে
দ্বন্দ্বই নেই তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে।
মানুষের যিনি শিব
তিনি বিষ পান করেন বিষ কাটাবেন বলে।
'ভিক্ষা দাও' 'ভিক্ষা দাও' দ্বারে দ্বারে রব উঠল তার কণ্ঠে—
সে মুষ্টিভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা।
নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস
তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান।
দুর্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।

১ "আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশির কোনও রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।" রথযাত্রা-র আরম্ভে কবির মন্তব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ৬, (প, ব, স) পৃঃ ১১২৭। আরো দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রজীবনী ৩, পৃঃ ১৫১, পাদটীকা।

২ বর্তমান ভারত—বিবেকানন্দ (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন, ১৩৬৯, পৃঃ ২৪১)

৩ রবীন্দ্ররচনাবলী ২২, (বি, ভা), গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৫১০

৪ Rabindranath Tagore Poet and Dramatist—Edward Thompson, London, 2nd Ed., 1940, P. 47

৫ "To Shakespeare the people are only an object of history, not its actor." Shakespeare Our Contemporary —Jan Kott, University Paperback, 1970, P. 160

৬ সোফোক্লেসের King Oedipus নাটক।

৭ সোফোক্লেসের Oedipus at Colonus নাটক।

৮ এলিয়টের Murder in the Cathedral নাটক।

৯ রবীন্দ্ররচনাবলী ৬, (প, ব, স), পৃঃ ১১২৭

১০ এলিয়টের The Hollow Men কবিতার শেষ চরণ।

১১ গদ্যকবিতা আর অন্নদাশঙ্কর— শঙ্খ ঘোষ (অনুক্ত পত্রিকা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮০), ২ সংখ্যক পাদটীকা।

১২ আধুনিক বাংলা কবিতা—বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৩, পৃঃ ৩১। মনে হয়, The Oxford Book of Modern Verse 1892-1935 বইতে ইয়েটস-কে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-বিষয়ে পেটারের গদ্যরচনাংশকে গদ্যকবিতারূপে ('Mona Lisa') ব্যবহার করতে দেখে বুদ্ধদেব বসু এই কাজে উৎসাহ পান।